সিডো(CEADAW)ঃ অনুবাদ অপবাদ ধন্যবাদ

দিলরুবা শাহানা

শুরুটা এভাবে হতে পারে। সময় ১৯৮২ সাল। দিনটি ছিল ডিসেম্বরের দশ তারিখ। ঢাকার রমনা উদ্যানে সম্মিলিত নারী সমাজের সমাবেশ ছিল ঐদিনে। পরদিন বাংলাদেশের সব পত্রিকাতে সম্মিলিত মহিলা জমায়েতের খবর প্রকাশিত হয়। খবরে নারীসমাজের পক্ষে গৃহীত সুপারিশমালাও ছাপা হয়েছিল। ঐ সমাবেশে বিচারপতি মোস্তফা কামাল নারী নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে জরুরী কর্মসূচী গ্রহণের জন্যে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তৎকালীন মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ সাফিয়া খাতুনও উপস্থিত ছিলেন সমাবেশে। সম্মিলিত নারী সমাবেশে গৃহীত সুপারিশগুলো ছিল

'মহিলাদের স্বাধীনতা, অধিকার সংরক্ষণ এবং নির্যাতন বন্ধের দাবীতে আইন প্রণয়ন, আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন, বর্তমানে প্রচলিত অপর্যাপ্ত আইন সমূহের যথাযথ সংশোধন, যৌতুক বিরোধী আইনের সঠিক বাস্তবায়ন, জাতীয় মহিলা কাউন্সিল গঠন ইত্যাদি।'('দৈনিক বাংলা' ১১ই ডিসেম্বর ১৯৮২)

লক্ষণীয় ঐ সুপারিশ মালাতে জাতিসংঘের সিডো(Convention on Elimination of All forms of Discrimination Against Women) সনদ স্বাক্ষর ও তার আলোতে নারীর প্রতি বৈষম্য অপনোদন বা দূরীকরন বিষয়ে সরকারের কাছে কোন দাবী জানানোর কথা উল্লেখ ছিলনা।

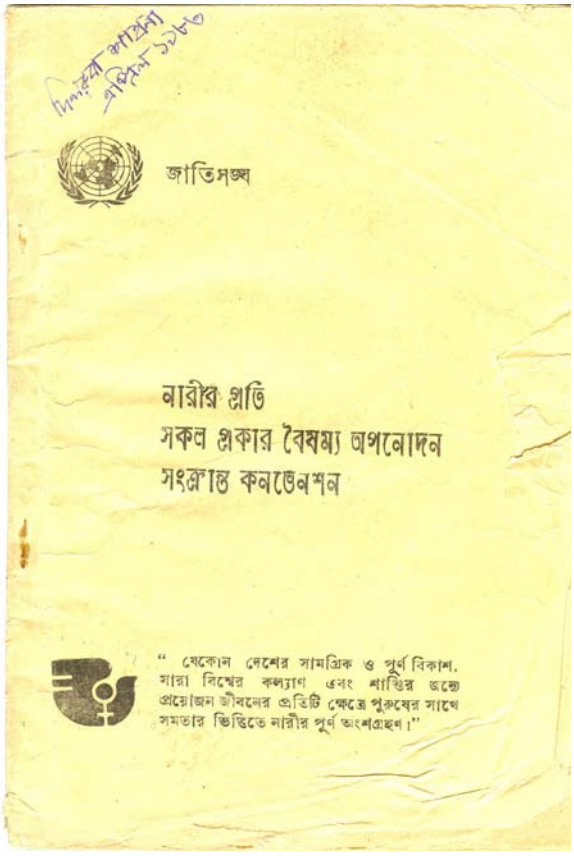

প্রশ্ন উঠতে পারে কেন ছিলনা? জাতিসংঘে CEADW গৃহীত হয়েছেতো তারও বেশ আগে অর্থাৎ ১৯৮০ সালে। তারপরও কেন অতো বিশাল সর্বদলীয় নারীসমাবেশে ঐ বিষয়ে কিছুই বলা হলোনা!

এর পিছনে কারণ হল যে সিডো নামের নারীর অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক দলিলের বাংলা অনুবাদের কাজ চলছিল, শেষ হয়নি তখনও। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সাধারন সম্পাদিকা ও গবেষক-লেখিকা মালেকা বেগমের সঙ্গে যখন এই দলিল বিষয়ে আলোচনা করি উঁনি দলিলটি বাংলা অনুবাদের জন্য আমাকে উৎসাহিত করেন। সে উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে অনুবাদ করার কাজ স্বেচ্ছায় নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম। তাঁর যুক্তি ছিল বৃহত্তর জনসমর্থন পেতে ও বিপুল সংখ্যাক মেয়েদের কাছে বিষয়টি নিয়ে যেতে হলে বাংলা দলিল জরুরী।

এতো বড় একটি আন্তর্জাতিক দলিলের বাংলা অনুবাদ সোজা কাজ নয়। তবে মনে হয়েছিল পড়াশুনা যখন করেছি আইন নিয়ে তখন শ্রমসাধ্য হলেও এই কাজে আনন্দ পাওয়া যাবে। তাছাড়া এতে আমার দেশের মেয়েরাও সচেতনভাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গৃহীত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারবেন। কথাটা ভেবে ভালও লাগছিল। আজ মনে হয় ভাবনাতে ভুল ছিলনা, প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়নি। তাই আজও বাংলাদেশে সিডো দিবস প্রতিবছরই উদযাপিত হয়।

অনুবাদ কাজে অংকের শিক্ষক বাবা যাঁর ইংরেজী ভাষায়ও দখল ছিল গভীর আমাকে শুধু উৎসাহিত নয় সাহায্য করেছেন অনেক। সমস্যাও হয়েছে, তর্ক-বিতর্কও করেছি তাঁর সাথে। শুরুতেই ঠিক করলাম আইনের প্রিয়াম্বল(মুখবন্ধ) ও কনক্লুসন(উপসংহার) নয় তবে সর্বশেষ ধারা ৩০নং অনুবাদে হাত দেব সবশেষে। সর্বমোট ত্রিশটি ধারা রয়েছে এতে। আইনের ভাষা গুরুগম্ভীর তাই সাধুভাষায় অনুবাদ লেখা শুরু করি। বাবা চলতি ভাষায় লিখতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি পরামর্শ নিলামনা। মনে হয়েছিল এতে আইনের গাম্ভীর্য হ্রাস পেতে পারে। এক একটি ধারা অনুবাদ করে বাবাকে পড়ে শুনাতাম। তার কথামত অনেক শব্দও পরিবর্তন করেছি, নতুন করে বাক্য বিন্যাস করেছি যাতে মূলভাব সহজে ধরা পড়ে। ভাষার গুরুচন্ডালী(সাধু-চলিত মিশ্রণ) করাতে বাবার ঠাট্টায় খুব অভিমান করে বাবাকে দেখাবোনা ঠিক করলাম।

অভিমানের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ফল ফলেছিল। প্রথম বিপদ হল যখন মুখবন্ধ অনুবাদে গিয়ে হিমসিম খাওয়া শুরু করি। তখন আমার বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং ভাইয়ের মত কলামিষ্ট হাসান ফেরদৌসের অকৃপণ সহযোগিতা পাই। উঁনি তখন ঢাকার জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন। হাসান ফেরদৌস জানলেন যে বিনা পারিশ্রমিকে অনুবাদ কর্ম করছি। তদুপরি প্রকাশ হওয়ার নিশ্চয়তা ছাড়াই এমন কঠিন কাজ করছি শুনে বোকাই ঠাওরালেন কিনা কে জানে? তবে তাঁর বোধহয় সহানুভূতি হয়েছিল খুব। তাই তাঁরই পরামর্শ ও উদ্যোগে জাতিসংঘের তথ্যকেন্দ্রের তৎকালীন পরিচালক জাপানী ভদলোক যার নাম হিশাশী উনো, তার সাথে সাক্ষাত করি। তার কাছে বক্তব্য রাখি যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এই দলিল প্রচার ও বিষয়বস্তুর প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ স্বাক্ষর আদায় ও এর মর্ম বাস্তবায়ন

করাতে অগ্রণী ভূমিকা নেবে তাই তথ্যকেন্দ্রের সাহায্য এটি ছাপানোর ব্যবস্থা করা গেলে ভাল হয়। তথ্যকেন্দ্রের পরিচালক হিশাশী উনো সহযোগিতা করতে রাজী হয়ে যান।

মহিলা পরিষদের মালেকা আপাও অত্যন্ত আশান্বিত হন খবর শুনে। পুরো অনূদিত সিডো মালেকা আপাকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি আমার বার কাউন্সিলের এক্সামের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। প্রথমপঠনে ধরা পড়ে সাধুভাষাটা যেন ভারী জটীল লাগছে। মালেকা আপা ও মহিলা পরিষদের অন্যান্যরা মত প্রকাশ করেন যে চল্‌তিভাষায় দলিলটি প্রকাশ হলে সহজে সবাই বুঝবে। আমি ব্যস্ত যেহেতু তাই মহিলা পরিষদের রাখীদি(রাখী দাস পুরকায়স্থ) সাধুভাষা থেকে চল্‌তিভাষায় রূপান্তরের কাজ করে দিতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন। ফলে প্রকাশনাও পিছিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ১৯৮৩সালের এপ্রিল মাসে বাংলাভাষায় নারীর অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইনগত দলিল প্রথম প্রকাশিত হয়। খুব আনন্দ হল তা দেখে। তবে এরপরের কঠিনকাজ মহিলা পরিষদের সবাই মিলে করলেন। প্রচার, প্রসার ও জনমত সৃষ্টিও সোজা ব্যাপার নয়। অর্থ, স্বীকৃতি বা ধন্যবাদ প্রাপ্তির জন্য কাজটি করা হয়নি। কাজটি করার পেছনে প্রত্যাশা ছিল যেন এর বার্তা ব্যাপক জনমানুষের কাছে পৌঁছায়। মহিলা পরিষদের সুশৃংখল প্রচারের কল্যাণে সিডো দলিল বাংলাদেশের ব্যাপক অঞ্চলে পৌঁছেও ছিল। তবে সম্মিলিত নারী সমাজের সব সংগঠন, নারী পক্ষ, মহিলা আইনজীবীরাও সচেতন ভূমিকা রাখেন।

ঢাকায় শিক্ষিত, সচেতন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় দলিলের বার্তা। সেই সাথে মহিলা পরিষদের আবেদন লিপি যাতে সিডো স্বাক্ষর, ও এর বাস্তবায়ন বিষয়ে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য সবার কাছে সহযোগিতা চাওয়া হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারী সংস্থা কোন জায়গা বাদ দেইনি আমরা। সিডো স্বাক্ষরে সরকারকে নমনীয় করতে সমাজ কল্যাণ ও মহিলা মন্ত্রণালয়ের উপ সচীব মাহ্‌মুদা খাতুন বা বেগম ও আইন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচীব তালুকদার সাহেবের ইতিবাচক ভূমিকার কথা স্মরণযোগ্য।
সে সময়ে আইন মন্ত্রণালয়ের তালুকদার সাহেব পিতৃসুলভ সস্নেহ হাসি মুখে নিয়ে জানতে চেয়েছিলেন
‘লং টার্ম ও শর্ট টার্ম প্রত্যাশা কি আপনাদের?’
এ বিষয়ে আগে গোছানো ভাবনা ছিলনা যদিও। তব ভড়্‌কে না গিয়ে বললাম
‘ শর্ট টার্ম প্রত্যাশা হচ্ছে আপনাদের সহযোগিতায় জাতিসংঘের নারী দশক শেষ হওয়ার আগেই বাংলাদেশ এই ইন্টারন্যাশনাল লিগ্যাল ডকুমেন্ট স্বাক্ষর করবে আর লং টার্ম লক্ষ্য এর আলোকে আইন প্রণয়ন, বিদ্যমান আইন সংশোধন করে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করতে সরকারকে উদ্বুদ্ধ করা।’
শর্ট টার্ম প্রত্যাশা পূরণ হয়েছিল তবে দুঃখজনকভাবে সবটুকু নয়। কয়েকটি ধারা বাদ দিয়ে বাংলাদেশ সরকার দলিলটি গ্রহণ করে।

সিডো বিষয়ে প্রথম ধাক্কা খেলাম আমি ১৯৮৫সালে। নাইরোবীতে নারীদশক উদ্‌যাপন সম্মেলনে গিয়ে 'উইমেন ল' এন্ড ডেভেলপ্‌মেন্ট ফোরামে'র ওয়ার্কশপে সিডো নিয়ে আমার দেশের নারীদের সচেতন উদ্যোগের কথা বলতে চাই শুনে এক বিদেশী দাতা সংস্থার স্থানীয় প্রতিনিধি মহিলা বললেন
'You have already been rewarded for this এখন যদি তোমার অন্য বিষয়ে কিছু বলার থাকে তবেই তোমাকে স্পনসর করা যাবে।'

মনে হল যেন সে বুঝাতে চাইছে যে ঐ কাজের জন্যেতো পুরস্কার পেয়েছই। তাহলে ঐ একই বিষয়ে আবার কেন কথা বলা। আসল কথা হল তার দেশ সিডো স্বাক্ষরও করেনি, স্বীকৃতিও দেয়নি। সুতরাং সিডো নিয়ে কথা বলবে তেমন কাউকে এড়ানোর জন্যই এমন কথা বলেছিল সে।
নিঃস্বার্থ অনুবাদ করে কপালে ধন্যবাদ নয় জুটলো স্বার্থজড়িত অপবাদ।

এই অপবাদ আমাকে অনুবাদ থেকে পুরোপুরি বিরত করতে পারেনি অবশ্য। এরপরেও পছন্দনীয় কিছু পড়লে তা যদি সাধারন মানুষের জানলে উপকার হবে বলে মনে হয়েছে তখন ছিঁটেফোঁটা অনুবাদ করেছি। অর্থ, নামযশ, বা নিদেন পক্ষে ধন্যবাদের আশায়ও নয়। করেছি শ্রেফ মনের আনন্দে, সখের বশে।

তেমনি ছোট্ট এক প্রবন্ধের ভাবানুবাদ করেছিলাম। সে ঘটনা বিবৃত হচ্ছে এখানে। 'স্ট্রাকচারাল এ্যাডজাষ্টমেন্ট এন্ড ইলাষ্টিসিটি অব উইমেন্স লেবার' প্রবন্ধের লেখিকা যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির প্রফেসর ডায়ান এলসন। তাঁকে আমি চিনতামনা। তবে তাঁর লেখা প্রবন্ধটি আমাদের মাষ্টার্স কোর্সের পাঠ্য তালিকায় ছিল। আমার কাছে প্রবন্ধটি খুব ভাল লেগে ছিল। প্রবন্ধের ফটোকপি আমার সংগ্রহে রেখেছিলাম। দেশে ফিরেই সেটির অনুবাদ করে সম্পন্ন করি। প্রবন্ধ লেখিকার অনুমতি ছাড়াই অবশ্য অনুবাদের কাজটি করি। বাংলাদেশের 'সংবাদ' পত্রিকার মেয়েদের পাতায় লেখাটি প্রকাশিত হয়। লেখাটি বিষয়ে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া শুনি। কেউ কেউ বললেন স্ট্রাকচারাল এ্যাডজাষ্টমেন্ট বিষয়ে বাংলায় লেখাটা জরুরী কাজ হয়েছে। তবে এবিষয়ে এধরনের লেখা আরও চাই। কেউ মূল ইংরেজী প্রবন্ধটাও চেয়ে নিলেন। কেউ কেউ বললেন 'আরে এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা মেয়েদের পাতায় কেন?
ভাবলে হাসি পায় যে মূল প্রবন্ধের লেখিকা এক মেয়ে, অনুবাদকও মেয়ে আর মেয়েদের পাতায় প্রকাশিত বলেই কেউ কেউ এর উপযুক্ত গুরুত্ব নিয়ে দ্বিধা প্রকাশ করেছিলেন।

আমি ইচ্ছা করেই ‘সংবাদ’এর মেয়েদের পাতা বেছে নিয়েছিলাম। তখন প্রতি মঙ্গলবারে মেয়েদের পাতা প্রকাশ হতো। এর পেছনে কারন হল ঐ পাতায় লেখা ছাপা হলেও তার জন্য কোন সম্মানী দেওয়া হতোনা। ভবিষ্যতে যেন বলা না হয় যে শ্রেফ অর্থ উপার্জনের জন্য অনুবাদ করা হয়েছে। অর্থের প্রশ্ন জড়িত থাকলে আইনগত জটিলতাও হতে পারতো। যাকগে এইসময়ে বাংলাদেশের সুপরিচিত এক ব্যক্তিত্ব লন্ডনে যাচ্ছিলেন। উনি জানালেন যে প্রফেসর ডায়ান এলসনকে উনি ব্যক্তিগতভাবে চেনেন এবং তাকে বলবেন যে তার লেখা প্রবন্ধ বাংলায় অনুবাদ হয়েছো

আমার আর জানা হয়নি অনুবাদের খবর শুনে ডায়ান এলসন কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিলেন।

অনেক বছর কেটে গেছে। গতবছর পরিচিত একজনের মুখে প্রফেসর ডায়ান এলসনের কথা আবার শুনলাম। আমি নিজেই উদ্যোগ নিয়ে প্রবন্ধ অনুবাদের বিষয়টি তাঁকে জানাই। তবে সংকোচ হচ্ছিল এতো বছর পর জানাতে। তাঁর অসন্তোষ, অভিমান করার যথার্থ কারন হতে পারতো বিনানুমতিতে অনুবাদ। আমাকে বিস্মিত করে দিয়েছিল প্রফেসর ডায়ান এলসনের দ্রুত পাঠানো উত্তর। অত্যন্ত আন্তরিক ভাষায় ভদ্রমহিলা আমাকে অনুবাদের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। আমি যখন পূর্বানুমতি ছাড়া অনুবাদের কারনে তিরষ্কৃত হওয়ার আশংকা করছিলাম তখন ধন্যবাদটি আমার কাছে পুরষ্কার হিসেবে এসে পৌঁছালো।